জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ৩৩

বনজঙ্গল গাছপালা

অংশুমান দাশ

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা

বনজঙ্গল গাছপালা…
Bonjongol Gachpala

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮-এর পক্ষে অংশুমান দাশের 'বনজঙ্গল গাছপালা' প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

জ্ঞানগঞ্জের প্রতিটি প্রকাশনা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য https://gyangonjo.org/

মুদ্রণ জ্যোতি লেজার পয়েন্ট ৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
গ্রন্থন পাইওপিয়র ট্রেডার্স ১৬ ই পাটোয়ার বাগান লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
সামগ্রিক তত্ত্বাবধান আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

“সভ্যতার দোহাই দিয়ে যখন শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা আমাদের গ্রামে ঢুকল, তারা প্রথমেই জিজ্ঞেস করল—কোথায় তোমাদের রাজা? আমরা বললাম, আমাদের তো রাজা নেই, আমাদের আছে কৌমগত সিদ্ধান্ত। তারা হাসল। বলল, তাহলে তোমরা বর্বর।”

আদিবাসী সমাজের মুখে মুখে চলে আসা এই গল্পই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মূল সত্য উন্মোচিত করে। আজ যখন ‘কার্বন ক্রেডিট’, ‘নেট জিরো’, ‘প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান’-এর নামে নতুন উপনিবেশবাদ আমাদের বন-জঙ্গল দখলের ষড়যন্ত্র করছে, তখন আমাদের সেই মৌখিক ইতিহাসকে স্মরণ করা জরুরি।

১৭৬৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন মেদিনীপুরের জঙ্গল গুলিতে তাদের থাবা বসায়, তারা দেখতে পেয়েছিল এক জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র—যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বনকে মায়ের মতো লালন করেছে। কিন্তু ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে এই সব “অগম্য পাহাড়ি জঙ্গল” ছিল শুধুই কাঠের ভাণ্ডার। তাদের দলিলে এই অঞ্চলগুলির বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে “অসাধারণভাবে আদিম” হিসেবে।

গবেষণায় দেখা যায়, ১৭৬৭ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে ব্রিটিশরা বঙ্গের বনাঞ্চলকে *ব্যতিক্রমী অঞ্চল* হিসেবে চিহ্নিত করেছিল—কারণ এখানকার মানুষ তাদের দেওয়া প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করেছিল। চুয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ—এগুলোই ছিল উপনিবেশ- বিরোধী প্রতিরোধের ইতিহাস।

১৮৬৫ সালের বন আইন ছিল এক চূড়ান্ত ঠগবাজি। যেসব বনে মানুষেরা জন্মের পর জন্ম ধরে বসবাস করছে, সেগুলোকে রাতারাতি “সংরক্ষিত বন” ঘোষণা করা হলো। তাদের ঐতিহ্যগত অধিকারগুলিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হলো “বন অপরাধ” হিসেবে।

ব্রিটিশ কর্মকর্তা রিববেনট্রপ নিজেই তার Forestry in British India বইয়ে লিখেছেন: “আমাদের প্রাক্তন প্রশাসকরা কখনো ভাবেনি যে

বনগুলি সবসময় কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে... বন কৃষির জন্য প্রতিবন্ধক এবং ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য তাকে বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হত।"

আজকের রেড্ড প্লাস, কার্বন অফসেট, নেট জিরোর নামে যে নতুন ঔপনিবেশিক প্রকল্প চালানো হচ্ছে, তা ব্রিটিশ বন আইনের চেয়ে কোনো অংশে কম বিপজ্জনক নয়। ভেরা-সনদপ্রাপ্ত কার্বন ক্রেডিটের ৯০%ই "ভুতুড়ে ক্রেডিট"—যার কোনো অস্তিত্বই নেই। তবুও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি আদিবাসী অঞ্চলে এই ক্রেডিট কিনে তাদের দূষণকে "কার্বন নিরপেক্ষ" বলছে।

কম্বোডিয়ার সাউদার্ন কার্ডামম রেড্ড প্লাস প্রকল্পে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর কী নির্মম অত্যাচার হয়েছে—জোরপূর্বক উচ্ছেদ, যৌন সহিংসতা, জমি দখল—সে খবর আমরা জানিনা। উগান্ডার মাউন্ট এলগন প্রকল্পে বেনেট সম্প্রদায়কে তাদের পৈতৃক ভিটেমাটি থেকে তাড়ানো হয়েছে। কেনিয়ার কাসিগাউ প্রকল্পে নারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগত যৌন নির্যাতনের খবর এসেছে।

বাঙলার সুন্দরবনকে নিয়ে আন্তর্জাতিক কার্বন বাজারে কী পরিকল্পনা চলছে, তা আমাদের জানানো হয়নি। আমাদের ঐতিহ্যবাহী, মৎসজীবী সম্প্রদায়ের অধিকার অগ্রাহ্য রেখে তাদের বন ব্যবস্থাপনার নামে নতুন করে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামের আদিবাসী অঞ্চলে একফসলি বৃক্ষরোপণের নামে যে জমি দখল চলছে, তা আসলে ঔপনিবেশিক বন ব্যবস্থাপনারই ধারাবাহিকতা মাত্র।

আদিবাসী সমাজে বন কখনই পণ্য ছিল না। তাদের জন্য বন হলো, তাদের সমষ্টিগত পরিচয়, তাদের বাস্তুসংস্থানিক জ্ঞান ব্যবস্থার ক্ষেত্র, তাদের খাদ্য সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্র। আমরা বিশ্বাস করি: "বন একটি বাসযোগ্য গ্রহের জন্য অ-আপসযোগ্য অবকাঠামো"—কিন্তু কাঠ-কার্বনের জন্য নয়, বরং

জীবনের জন্য। তাই রেড্ড প্লাস, কার্বন অফসেট এবং সব ধরনের মিথ্যা সমাধানের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের পূর্বানুমোদিত সম্মতি ছাড়া কোনো প্রকল্প চালু করা চলবে না। বন সংরক্ষণের জন্য তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে কেন্দ্রীয় স্থান দিতে হবে। নারী-নেতৃত্বাধীন বন ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন বাস্তুসংস্থানিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রত্যক্ষ অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৮৫৫ সালে লর্ড ডালহাউসি যখন "বৈজ্ঞানিক বন ব্যবস্থাপনা" চালু করেছিল, তখন এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষরা প্রতিরোধ করেছিল। আজও সেই একই প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে। আমরা বলতে চাই: আমাদের বন আমাদেরই রক্ষা করতে দাও। তোমাদের কার্বন মার্কেট, তোমাদের অফসেট স্কিম, তোমাদের নেট জিরো—এসব আমরা চাই না। কারণ আমরা জানি: "যেখানে বৃক্ষরাজি থাকে, সেখানে জীবন থাকে। যেখানে জীবন থাকে, সেখানে কৃষ্টি থাকে। আর যেখানে পরম্পরার কৃষ্টি থাকে, সেখানে প্রতিরোধের আগুন কখনও নিভে না'। শত উপনিবেশবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াবার অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল।

অত্রি ভট্টাচার্য
৩ নভেম্বর, ২০২৫

বেলেম শীর্ষ সম্মেলনে ‘ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরএভার’ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ

বিশ্বের আদিবাসী ও পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা ব্রাজিল সরকারের নতুন বন সংরক্ষণ তহবিলকে ‘মিথ্যা সমাধান’ ও ‘সবুজ উপনিবেশবাদ’ আখ্যা দিয়েছেন

বেলেম, ব্রাজিল, ৬ নভেম্বর ২০২৫: ব্রাজিল সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ‘ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরএভার ফেসিলিটি’ (TFFF) নামক নতুন আন্তর্জাতিক তহবিলের ঘোর বিরোধিতা জানিয়েছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ন্যায়ের জন্য প্রচারাভিযান (ডিসিজে) এবং ব্রাজিল আর অন্য দেশের পরিবেশ আর আদিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো। বেলেমে অনুষ্ঠিত নেতাদের এক শীর্ষ সম্মেলনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলে, সম্মেলনের ফাঁকেই বিশ্বব্যাপী একজোট প্রতিবাদ দেখা দেয়।

বিরোধী পক্ষের দাবি, TFFF বন সংরক্ষণের নামে বনকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করার এবং বিশ্ব ব্যাংকের মতো বিতর্কিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে বনের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার একটি চক্রান্ত মাত্র। তারা এটিকে ‘মিথ্যা সমাধান’ ও ‘সবুজ রঙে সজ্জিত নতুন উপনিবেশবাদ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

‘বন আমাদের জীবন্ত অঞ্চল, বিনিয়োগের পণ্য নয়’

ব্রাজিলের আদিবাসী নেতা ও পরিবেশকর্মীরা সরাসরি তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। গাভিয়াও রিয়াল গ্রামের প্রধান জোনাস মুরা বলেন, “সরকার বন বাঁচানোর কথা বলে, কিন্তু এই তহবিলের আড়ালে তারা আমাদের জীবনের

দাম নির্ধারণ করছে। বন কোনো পণ্য নয়। বিশ্বের আরও তহবিলের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হাজার হাজার বছর ধরে যারা এই বন রক্ষা করে এসেছে তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর।"

আমাজন ওয়ার্কিং গ্রুপের (জিটিএ) সমন্বয়কারী সিলা মেসকুইটা আপুরিনা তার বক্তব্যে আরও কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, "TFFF হলো পুরনো উপনিবেশবাদকে সবুজ রঙে সাজানো। তারা আমাদের বোঝাতে চাইছে যে বন বিক্রি করাই এটিকে বাঁচানো, কিন্তু তারা আসলে যা করছে তা হলো এটিকে আর্থিক পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া। কোনো তহবিল আমাজনের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্য কিনতে পারবে না।"

কী নিয়ে এত বিরোধিতা?

বিরোধী সংগঠনগুলোর মূল অভিযোগগুলো হলো:

১.আর্থিকীকরণ: এই তহবিল বনকে 'কার্বন স্টক' বা বিনিয়োগের পণ্যে পরিণত করছে, যা জলবায়ু সংকট সৃষ্টিকারী একই মুনাফাকেন্দ্রিক চিন্তাধারাকে আরও শক্তিশালী করে।

২.নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর: বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিশ্ব ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাবে, যাদের উন্নয়ন প্রকল্পে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

৩.অধিকার হরণ: এই প্রক্রিয়ায় আদিবাসী ও স্থানীয় communities-দের ভূমি অধিকার, স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সরাসরি তহবিলে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি।

৪.ঐতিহাসিক দায় এড়ানো: ধনী দেশগুলি এই তহবিলের মাধ্যমে তাদের দেওয়া জলবায়ু অর্থায়নের ঐতিহাসিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে এবং গ্লোবাল সাউথের কাছে ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে পিছিয়ে থাকবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও সোচ্চার

ইন্দোনেশিয়ার ওয়ালহি বন প্রচারক উলি সিয়াগিয়ান বলেন, "বনের উপর দামের ট্যাগ লাগানো হলো নতুন পোশাক পরা উপনিবেশবাদ। TFFF আমাদের অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ সেই একই ব্যাংক ও সরকারগুলোর হাতে তুলে দেয় যারা প্রথমে বন উজাড়কে চালিত করেছিল।"

গ্লোবাল ক্যাম্পেইন টু ডিমান্ড ক্লাইমেট জাস্টিসের গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটর রচিতা গুপ্তা দাবি করেন, "আমাদের প্রয়োজন আরও সবুজরঙা আর্থিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নয়, বরং সরকারি, ঋণ-বিহীন, অনুদান-ভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়নের, যা সরাসরি আদিবাসী ও স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর কাছে পৌঁছাবে।"

প্রকৃত সমাধান কোনটি?

বিরোধী পক্ষের যুক্তি হলো, বন রক্ষার প্রকৃত উপায় হলো বন উজাড়ের মূল কারণগুলো – যেমন জীবাশ্ম জ্বালানী ভিত্তিক শিল্প ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন – মোকাবেলা করা। সেইসাথে আদিবাসী ও স্থানীয় সমাজের ভূমির অধিকার ও সার্বভৌমত্বকে পূর্ণভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের হাতেই বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া। এই ব্যাপক প্রতিবাদ দেখিয়ে দিচ্ছে যে, COP30-এর আয়োজক ব্রাজিল যদি বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে চায়, তাহলে তার উচিত প্রকৃত ও ন্যায়সংগত সমাধানের পথে এগোনো, বনকে মাত্র আরেকটি আর্থিক পণ্যে পরিণত করার ঝুঁকিপূর্ণ পথ থেকে সরে আসা।

গাছপালা বনজঙ্গল ।। অংশুমান দাশ

এই প্রবন্ধটি লিখে কোনও লাভ নেই তা আমি লেখার আগে থেকেই জানতুম। পড়েও যে কোনও লাভ আছে এ কথা হলফ করে বলতে পারি না। নানা জায়গা থেকে অনুরোধ ছিল বন-জঙ্গল-পরিবেশ নিয়ে 'গুছিয়ে একটা লেখা' – এবারে সমস্যা হল, কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছি না। বিষয়টা জ্যামিতির উপপাদ্যও নয় আর এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলাও নয়! ধাপে ধাপে একের পর এক চিন্তাগুলোকে যুক্তি অনুযায়ী অথবা সময়কাল অনুযায়ী, কোনও ভাবেই বেঁধে ফেলা যাচ্ছে না। তাই এলোমেলো কথা বলার মত করেই এই লেখা এগোবে। কথা শুনতে শুনতে যেমন প্রশ্ন জাগে – তেমনি প্রশ্ন জাগবেই – উত্তর দেওয়ার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ থাকছি না, তাই উত্তর খোঁজার দায়িত্বও পাঠক পাঠিকার। সব প্রশ্নের অবশ্য উত্তর থাকে না – থাকলেও আমি জানব, সবাই জানবেন এমন নয়! কিন্তু প্রশ্নোত্তরের চাপান উতোরে কিছু একটা বোঝা যাবে – এইই বিশ্বাস। এই লেখাটিকে তিনটে দিক দিয়ে দেখা যায় - মানুষ কিভাবে প্রকৃতিকে দ্যাখে, প্রকৃতি কিভাবে মানুষকে দেখে আর মানুষ কিভাবে মানুষকে দ্যাখে। তবে এইরকম কোনও নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদবিন্যাস নেই – খুঁজে দেখলে এই তিনটে দিকই পরস্পরের সঙ্গে মিলেজুলে আছে।

৪০০ কোটি বছর আগে পৃথিবী, ২০ কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী, ৯০ লক্ষ বছর আগে লেজহীন বাঁদর, ২০ লক্ষ বছর আগে সোজা হয়ে দাঁড়ানো আধা মানুষ আধা বাঁদর, ৫ লক্ষ বছর আগে আগুন ব্যবহার, ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা থেকে নানা জায়গায় মানুষের ছড়িয়ে পড়া, ১০ হাজার বছর আগে চাষবাস শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একজায়গায় থিতু হওয়া। ততদিন কেউই পরিবেশ নিয়ে ভাবেননি – মানে ভেবে থাকলেও আমরা জানি না। কিন্তু ভাবার কারণ কি ছিল না? হাজার হাজার জাতি ও প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে – কোনও জায়গা কখনও জলে বেমালুম ডুবে গেছে, কোথাও অনাবৃষ্টিতে মাটি ফুটিফাটা হয়েছে। এমন কি আমাদের সাথে চলতে থাকা মানুষ নিয়ান্ডারথাল আর ডেনিসোভানরা লুপ্ত হয়ে গেছে। নিয়ান্ডারথালরা আমাদের তুলনায় শক্তিশালী ছিল – তাও। নতুন প্রজাতির আসা যাওয়া, ভূপ্রকৃতির গঠনের পরিবর্তন – পৃথিবী এসব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে ৩০০ কোটি বছর আগে থেকেই। ময়ূর সাপ খাবে, সাপ ব্যাঙ খাবে, ব্যাঙ পোকা খাবে, পোকা ঘাস খাবে – এ নিয়ম তো তাবৎ জীবন্ত জিনিসের ক্ষেত্রে খাটে। এমন কি মানুষের ক্ষেত্রেও। মানুষও এক ধরণের খাদক এবং সে শিকার করে খেয়ে এসেছে বরাবরই। বাজপাখি অথবা বাঘের মত। বাঘের অস্ত্র তার দাঁত, নখ, গতি, গায়ের জোর। বাজের অস্ত্র তার দৃষ্টিশক্তি, নখ, ক্ষিপ্রতা। তাদের অস্ত্র তাদের শরীরেই ফিট করা। মানুষের শরীরে এ সব অস্ত্র নেই, তাই মগজাস্ত্র কাজে লাগিয়ে তাদের অস্ত্র বানিয়ে নিতে হয়েছে। তবে কিসের এত মাথা ব্যাথা? মানুষ সব খেয়ে ফেলল, ভেঙে ফেলল, মেরে ফেলল বলে এত হই হল্লা কিসের? বাস্তুতন্ত্রে কিন্তু এই খাদকদলের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। একটা গল্প বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

বিংশ শতকের শুরুর দিকে আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক থেকে নেকড়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় মানুষের শিকার হয়ে। তার ফলে ইয়েলোস্টোন হরিণদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে – তাদের সংখ্যা বিপুল বেড়ে যায়। তারা ঘাস, গাছপালা সব মুড়িয়ে খেয়ে ফেলতে থাকে। নদীর চরে হরিণের দাপাদাপি ও গাছের, বিশেষত গাছের শিকড়ের অভাবে ভূমিক্ষয় বেড়ে যায়। সেই মাটি নদীতে জমা হতে হতে নদী মজে যায়। পার্ক প্রায় মরুভূমি হতে বসে। ১৯৯৫ সালে কিছু নেকড়ে ইয়েলোস্টোনে এনে ছাড়া হয় – ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়। কয়েকটা নেকড়ে মিলে সব হরিণ খেয়ে ফেলে তা নয় – তারা আসলে হরিণদের চারণক্ষেত্র বদলে দেয়। যে সব জায়গায় নেকড়েদের পক্ষে শিকার ধরা সহজ, তারা সেই সব জায়গা এড়িয়ে যেতে থাকে। ফলে সেখানে ঘাস ফিরে আসে, গাছ ফিরে আসে। নেকড়ের ফেলে রাখা মাংস খেতে শকুন, ঈগল আসে। ক্রমে আসে অন্যান্য পাখি। বিভার। বেজি। ধীরে ধীরে নদী প্রাণ ফিরে পায় – সেই সঙ্গে গোটা ইয়েলোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক। এখানে যদিও প্রাথমিক ভাবে মানুষের ভূমিকা ঋণাত্মক, তবে খাদক হিসাবে নেকড়ের ভূমিকা অপরিসীম। সেরকম খাদক হিসাবে মানুষেরও ভূমিকা আছে। যেমন, ভারতে হাতি এসেছে বাইরে থেকে এবং যখন থেকে এসেছে, তখন থেকেই মানুষ হাতি শিকার করছে। না করলে ভারত একটা আস্ত হাতিশালায় পরিণত হত। একটা বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক আরও অনেক জটিল সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত – তাই কার কান টানলে কার মাথা আসবে, এ ব্যাপারে কোনও গ্যারান্টি নেই। সাধারণ বুদ্ধিতে অনেকসময় এই সম্পর্কের জাল বোঝা যায় না। সে জন্য স্বাভাবিকভাবে বা প্রাকৃতিকভাবে প্রকৃতিতে যখন কোনও বদল ঘটে তা সবসময় একের বেশি উপাদানের ক্ষেত্রে একসঙ্গে ঘটে, এবং বেশ কিছু সময় ধরে ঘটে – হঠাৎ করে নয়। যেমন পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গের উদ্ভব আশ্চর্যভাবে সপুষ্পক উদ্ভিদের বিবর্তনের সঙ্গে সমাপতিত। স্বাভাবিক পরিবর্তন চলে দীর্ঘ সময় ধরে, সামগ্রিকভাবেও এই পরিবর্তন সতত চলতে থাকে – একদম স্থায়ী হয়ে যায় না – এইটুকু অনুধাবন করতে পারলে অনেক ভাবনার জট ছাড়ে। সুতরাং মানুষ তার জৈবিক প্রয়োজনে জঙ্গল কাটছে, শিকার করছে তা একটা সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের পরিকল্পনার অন্তর্গত। 'জৈবিক প্রয়োজন' শব্দ দুটি ভুলে যাবেন না আশা করি।

'আমার গোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের প্রাচুর্য' – মানুষের আদিম চাহিদাগুলির মধ্যে একটি। মানুষের মত দূর্বল প্রাণীর পক্ষে একা একা বেঁচে থাকা যে অসম্ভব তা জন্মের শুরু থেকেই বুঝে নিয়েছি আমরা, সেই কুড়ি লক্ষ বছর আগেই। তাই গোষ্ঠী। গোষ্ঠীবদ্ধতাও একধরণের অস্ত্র। একসঙ্গে শিকার, খাবার খোঁজা, সুরক্ষা দেওয়া। এগুলির জন্য চাই শক্তিশালী পুরুষ, এমন নারী – যা শক্তিশালী পুরুষ উৎপাদনে সক্ষম। প্রয়োজনে অন্যের জমি, অন্য গোষ্ঠীর নারী, অন্য গোষ্ঠীর পুরুষ জবরদখলে কোনও দ্বিমত ছিল না। 'আমার গোষ্ঠীর ভালো'র সঙ্গে অচীরেই 'আমার ভালো' জুড়ে যায় – যখন চাষ শুরু হয়। উদ্বৃত্তের মুখ দেখেই মানুষ সঞ্চয়ের কথা ভাবতে শুরু করে – যার কাছে যত খাবার সে তত

ক্ষমতাশালী - এই সমীকরণটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যেও কে প্রভাব খাটাবেন বেশি, তার সহজ উত্তর - যার কাছে খাবার আছে, খাবার উৎপাদনের জমি আছে, খাবার উৎপাদনের করার জন্য শ্রম আছে (আরও পরে, অর্থাৎ হাল আমলে - খাবার কেনার বা শ্রম কেনার অর্থ আছে)। সুতরাং 'আমার' ভালো, তার একটু বৃহত্তর পরিসরে আমার 'গোষ্ঠী'র ভালো, আমার ভালোকে পরিপুষ্ট করবে যারা তাদের ভালো — এই একটা স্বার্থের বুদবুদে আমরা আটকে আছি চরিত্রগতভাবে কুড়ি লক্ষ বছর ধরে। দ্বন্দ্বের জায়গাটা অতি পরিষ্কার — ব্যক্তি বনাম সমাজ, আমার সমাজ বনাম অন্য সমাজ, আমার সমাজের সঙ্গে জুড়ে থাকা সমাজ বনাম অন্য বৃহত্তর সমাজ। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের এই গোলকধাঁধার বাইরেও নিজের ও নিজের গোষ্ঠীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য দ্বন্দ্ব আছে। যেমন - আমার প্রজাতি বনাম অন্য প্রজাতি। নীল গাই আমার ফসল খেয়ে নিচ্ছে, সুতরাং নীল গাইয়ের সঙ্গে আমার খাদ্য দখলের লড়াই। সুতরাং বস্তুগত (যার আদিম রূপ খাবার) এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অবস্তুগত চাহিদা মেটানোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে দ্বন্দ্ব — যা বৃহৎ ও সর্ববৃহৎ স্বার্থ থেকে আমাদের সবসময় দূরে রাখবে। সহজ কথায় নিজের নিজের গোষ্ঠীর ভালো দেখতে দেখতে আমরা আর সমগ্র মানবজাতি তথা পৃথিবীর ভালো দেখতে পাব না। অথচ মজার ব্যাপার হল, সর্বস্তরে এই দ্বন্দ্ব আমাদের স্বার্থসিদ্ধি আরও কঠিন করে দেবে — যার ফল দ্বন্দ্বের তীব্রতা। এবং সর্ববৃহৎ স্বার্থ দেখতে না পাওয়ার দরুণ অবশ্যম্ভাবী পতন। যেমন ধাঁই করে জলে গিয়ে পড়ব জেনেও আমরা রোলার কোস্টারে চেপে বসি।

উদাহরণে আসা যাক। স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটা গাড়ির বদলে দুটো গাড়ি, সুবিধার জন্য একবার ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলা যায় এমন জিনিস যা পরিবেশ দূষণের সাহায্যকারী হলেও আমরা কিনতে থাকব — এবং এই কেনার জন্য সৎ ও অসৎ উপায়ে অপরিমিত রোজগারে আমরা মেতে থাকব। প্রতিযোগিতা চালু থাকবে — অন্যে কম পেলে তবে আমি বস্তুগতভাবে বেশি পাব, এবং অবস্তুগতভাবে অন্যের থেকে ভালো থাকার আনন্দও আমার বেশী হবে। কয়েক স্তর ওপরে - শহুরে স্বাচ্ছন্দ্য (এখানে শহুরে মানুষ একটা গোষ্ঠী) তখনই টিকে থাকবে যখন কৃষক, শ্রমিক, কাজের লোক, কারিগর - এই গোষ্ঠী, শহরকে উৎপাদন ও শ্রম যোগান দিতে পারবে। এবং এই উৎপাদন ও শ্রম যতটা সস্তায় হয় ততটাই শহুরে গোষ্ঠীর লাভ। অসম প্রতিযোগীতা। এখানে মানুষ প্রজাতির যে বৃহত্তর স্বার্থ আমরা উপেক্ষা করলাম, তা হল প্রজাতি হিসাবে গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ জল-মাটি-জৈববৈচিত্রের অবস্থা (কারণ উৎপাদনকে সস্তা ও অপ্রতুল রাখতে আমরা দূষণকে প্রশ্রয় দিয়েছি)। গোষ্ঠীর এই ক্ষুদ্র স্বার্থ আমরা কর্পোরেটের মুনাফার পিছনেও দেখছি। কর্পোরেট এই স্বার্থকে কায়েম করতে বিশেষ বিশেষ শাসক গোষ্ঠীকে প্রয়োজন মত সাহায্য ও ব্যবহার করেছে। কারণ শ্রম ও সম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহারের ছাড়পত্রের জন্য শাসক গোষ্ঠীর সাহায্য লাগবে — এবং শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার অর্থ, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি আফিম। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব অসংখ্য ওভারল্যাপিং

ভেন ডায়াগ্রামের মত। প্রয়োজনমত শহুরে অথবা পুঁথিশিক্ষিত অথবা বিত্তবান অথবা এই সব কটার কম্বিনেশনে তৈরি বিভিন্ন গোষ্ঠী; কৃষক-শ্রমিক-কারিগরদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এক ধাপ নেমে এলে এইসব একদিকে থাকা গোষ্ঠীরাও আবার পরস্পরকে প্রয়োজনভিত্তিতে সহায়তা করছে কিন্তু কখনও কখনও দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হচ্ছে। এই সমস্ত চাহিদা কিন্তু জৈবিক প্রয়োজনে নয় – এবং এর মূলে রয়েছে অন্যের থেকে উৎকৃষ্ট থাকার সুড়সুড়ি।

উন্নয়ন এরকম একটা সুড়সুড়ি। রাস্তা চওড়া হবে, নদীতে বড় বাঁধ বসবে, ব্রিজ তৈরি হবে, কারখানা বসবে – কিছু গোষ্ঠীর সুবিধার্থে, 'উন্নয়ন' ও 'পরিবেশ' এই দুই ধারণাকে সবসময় মুখোমুখি লড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বৃহৎস্বার্থ যে সব সম্পদের সাথে জড়িয়ে – জল-জমি-জঙ্গল-জৈববৈচিত্র, তাকে কখনই পাত্তা দেওয়া হবে না। কারণ বৃহৎস্বার্থ নয়, ক্ষুদ্র স্বার্থের কানাগলিতেই আমরা ঘুরপাক খেতে থাকব।

একটু কেজো সংখ্যায় আসা যাক। ভারতবর্ষে ৬৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন, ৪৭ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল । ৬ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামের ২৬ শতাংশ গ্রাম জঙ্গলের লাগোয়া, যাতে আবার দেশের ২২ শতাংশ মানুষের বসবাস । এদের সঙ্গে যদি জুড়ে নিই গ্রাম থেকে শহরে কাজ খুঁজতে আসা বস্তিবাসী (৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ছিল ২০১১ তে - মোট শহরবাসীর ২০ শতাংশ), আর এই সব গোষ্ঠীগুলিকে যদি একটি বৃহৎ গোষ্ঠী হিসাবে ধরি তবে এই গোষ্ঠীর চাহিদা, পণ্য ব্যবহার এবং শ্রম, শহরবাসী সুবিধেভোগী গোষ্ঠীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধির মেরুদন্ড। যদিও এই সমীকরণটার মধ্যে বিস্তর টানাপোড়েন আছে, জটিলতা আছে – কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই। এই বাস্তুতন্ত্র নির্ভর মানুষ ও বাস্তুতন্ত্র থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের 'উন্নত' হওয়ার চাহিদা শহুরে ভোগ্যপণ্য। সেভাবেই আমাদের শেখানো হয়েছে। সেই সংজ্ঞার এমন বিশ্বায়ন হয়েছে, যে আমরা মেনে নিয়েছি – উন্নত জীবনের মান ও মানে একই - ভোগ্যপণ্য। পণ্যের বদলে যদি তা হত সমস্ত গোষ্ঠীর জন্য সমান পরিষেবা – বিদ্যুতের, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের, ইন্টারনেটের – তাহলে এই দ্বন্দ্ব ঘুচত – কিন্তু 'সমান' শব্দটাই যে আমাদের উৎকর্ষের চাহিদার বিপরীতমুখী। ভোগ্যপণ্যকে আরাধ্য করে তুলতে কাগজের টাকা দরকার। এমনকি সঠিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিদ্যুতের পরিষেবা, যা নির্বাচিত সরকারের তরফে এমনিই পাওয়ার কথা, তা কিনতেও সেই টাকারই দরকার। এই দরকারে বাস্তুতন্ত্র নির্ভর মানুষেরাও পরিবেশ ও জৈববৈচিত্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছেন – সে তাদের অজ্ঞানতার জন্য নয়, 'উন্নত' হতে চাওয়া ও তার থেকে ক্রমাগত দূরে চলে যাওয়ার সাঁড়াশী আক্রমণের চাপে।

উদাহরণ স্বরূপ যশোর রোডের গাছ কাটার কথা তোলা যায়। ধুয়ো তোলা হয়েছে - আশপাশের গাছ কেটে জাতীয় সড়ক ১১২কে চওড়া করতে হবে, কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাড়ছে না। কারণ বনগাঁ থেকে রুগী নিয়ে কলকাতা যেতে অনেক সময়

লাগে। কারণ অনেক গাছ অনেক পুরোনো, তার ডালপালা ভেঙ্গে লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ২০১৮ সালের হাইকোর্টের রায় মেনে নিয়ে ২০২৩এর ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন – গাছ কাটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু এভাবে তো উন্নয়নকে আটকে রাখা যাবে না! ফলে অন্তত ৩৫৬টা গাছ কেটে ফেলে রেল লাইনের উপর দিয়ে পাঁচটা ফ্লাইওভার না করলেই নয়!

ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য পরিবহণের মূল্য বছরে ১৫৭০০ কোটি টাকা। বনগাঁ সীমান্তে ভারতের দিকে সীমানায় মালবাহী ট্রাক থাকতে পারে প্রায় ২০০০টি, সেখানে বাংলাদেশ সীমানায় ৭০০। সুতরাং সীমান্তের অবস্থা বোতলের মুখের মত – যতই রাস্তা চওড়া হোক, ভিড় করে ট্রাক জমে থাকবেই। এপাড়ে রাস্তা চওড়া করে তার সমাধান হবে কি? আর তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তার উপরে ১২০ ফুট চওড়া ফ্লাইওভারই বা করতে হবে কেন? তার মানে – আসলে রাস্তা আরও চওড়া হবে ভবিষ্যতে। তার মধ্যেই পরিপূর্ণভাবে চালু হয়ে যাবে অশোকনগর তেলের খনি। এই রাস্তায় মানুষ কলকাতা যাতায়াত করে থাকেন নিত্য। ট্রেন এক জনপ্রিয় পরিবহণ হওয়া স্বত্বেও শিয়ালদা থেকে বনগাঁ যাওয়ার ২৫টি ট্রেন, গড়ে একঘন্টার গ্যাপে। ট্রেন আরও বাড়ানো যায় না? কাজের সুযোগ কেন প্রতি পঞ্চায়েতেই তৈরি হবে না? কেন নাকে মুখে গুঁজে সকলকে মহানগরের দিকেই ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে হবে? বনগাঁ, অশোকনগর, হাবড়া, মছলন্দপুর – এখানের সরকারি হাসপাতালগুলির অবস্থাই বা কেমন? তা নিয়ে বিস্তারে যাচ্ছি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সব রুগীকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হবেই বা কেন? এই মূল প্রশ্নগুলি কবে উঠবে? এই রাস্তায় আছে শিরীষ, বট, অশ্বত্থ, মেহগনি, গুলমোহর, আম, অর্জুন ইত্যাদি গাছ। মাঝারি গাছের মধ্যে দেখেছি জারুল, সুবাবুল, জ্যাকারান্ডা, সোঁদাল। একটা শিরীষ গাছের তলায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলাম তিন রকম প্রজাপতি, দু রকম পিঁপড়ে, বুলবুলি, ময়না, শালিক, গুয়ে শালিক, ফিঙ্গে, সান বার্ড, প্যাঁচা, ওরিয়েল। সকলেই ব্রেকফাস্টে ব্যস্ত ছিল। আরও অনেক কিছু আছে – সব মনে পড়ছে না এখুনি। সব গাছ ভালো অবস্থায় নেই – কিছু গাছ রক্ষণাবেক্ষণ দরকার। কিছু হয়ত কেটে ফেলাও দরকার – কিন্তু এই সমীক্ষা করাও হয়নি, কোনও পরিকল্পনাও আছে বলে শুনিনি – ফলে সবার জন্য এক ওষুধ – খুন। যে কথা বলতে গিয়ে এ প্রসঙ্গ টেনে আনা, তা হল - স্থানীয় মানুষ কিন্তু গাছ কাটার পক্ষে। কারণ তাদের তথাকথিত উন্নয়ন দরকার। গাছ বাঁচিয়ে উন্নয়নের রাস্তা খুঁজতে কেউ রাজি নন। এ চাওয়া অথবা না চাওয়া হঠাৎ করে একদিনে তৈরি হয়নি – এর পিছনে কুড়ি লক্ষ বছরের অভ্যাস।

ভারতবর্ষে ২০২০-২১এ শুধু সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে ৩১ লক্ষ বৃক্ষ কাটা হয়েছে। এর বাইরের হিসাব নেই। আমাদের রাজ্যেই যত সড়ক হয়েছে কলকাতা থেকে পশ্চিম অথবা উত্তরে যাওয়ার পথে, তাদের জন্য হাজার হাজার গাছ খুনের কোনও মামলা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ বাদ দিন – গাছ কাটা নিয়ে সারা বিশ্বের মানসিকতা একই রকম - গাছ দিয়ে কাগজ হয়, কাঠ হয়, আঠা হয়, গাছ ফালতু ফালতু জায়গা দখল করে থাকে।

ওড়িসার রায়গাড়ায় আছে জেকে পেপারস কোম্পানির তিনটে কারখানার মধ্যে একটা। একরের পর একর তারা কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ইউক্যালিপ্টাস গাছ লাগিয়েছে স্থানীয় মানুষকে অর্থের লোভ দেখিয়ে। এই কাজে সাহায্য করেছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারা তাদের প্রজেক্ট হিসাবে। বিদেশী গাছ ইউক্যালিপ্টাসের বদগুণ নিয়ে বলার আর বাকি নেই। এই কারখানা এবং স্থানীয় জঙ্গলকে প্রতিস্থাপিত করে ইউক্যালিপ্টাসের মোনোক্রপ পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড় পায় কী করে? স্থানীয় মানুষ এই অর্থাগমে অবশ্য বেশ খুশি।

যত সহজে আমি 'স্থানীয় মানুষ' বলছি – স্থানীয় মানুষ ও তার খুশি হওয়া কিন্তু সময় ও অবস্থানের নিরিখে ততটা সমসত্ব নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জৈবিক স্বাভাবিক চাহিদাকে অতিক্রম করে গেছে (পড়ুন অতিক্রম করে যেতে বাধ্য হয়েছে) তার উৎকর্ষের চাহিদা এবং তা হাতে পাওয়ার একমাত্র রাস্তা - সেই অর্থনৈতিক চাহিদা। বাকি সব তার কাছে সাবানের বুদবুদ। স্থানীয় মানুষকে ক্রমাগত বঞ্চিত করতে থাকার এই ইতিহাস একটু ঘেঁটে দেখা যাক।

উত্তরাখণ্ডের পাইন বন নিয়ে কাব্যের ছড়াছড়ি, অথচ পাইনের রমরমা তার পণ্যযোগ্য কাঠ ও আঠার জন্য। পাইন সবাইকে সরিয়ে অতি দ্রুত জায়গা দখল করে, পাইনের পাতা সহজে পচে না বলে পাইন গাছের তলায় অন্য প্রাণ সহজে ঠাঁই পায় না। অন্যদিকে পাতায় রেজিন থাকার ফলে চট করে আগুন লাগে। যে জঙ্গল চিরহরিত নানা গাছপালা যেমন ওক, দেবদারু, শাল এইসবে ঢাকা ছিল, তা ব্রিটিশরা কেটে ফাঁক করে দিয়েছে কাঠের জন্য – যে কাঠে ইংল্যান্ডে তাদের বাড়ি হয়েছে। পরিবর্তে লাগানো হয়েছে সহজে বেড়ে ওঠা পাইন, তার পণ্যমূল্যের নিরিখে। স্থানীয় মানুষজনের হাত ধরেই, ভারতীয় ফরেস্টারদের অনুগ্রহে । দেরাদুনের আশপাশের জঙ্গল ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ইজারা নেয় – ক্রমে ১৯৩০ সাল নাগাদ বন সংরক্ষণের নামে স্থানীয় মানুষের বনাঞ্চল ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হতে থাকে। গবাদি পশু চরতে দেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এ নিয়ে নানা জায়গায় মারপিট ঝুট ঝামেলা হলেও – এই দমনের থেকে কোনও মুক্তি মেলেনি। এরপর ১৯৬১ সাল থেকে তেহরি ড্যামের শুরু – ১৯৭২এ শেষ – এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অথচ সুদূরপ্রসারী ও সার্বিক বদল ঘটে যায় পুরো অঞ্চল জুড়ে। পাহাড়ি অঞ্চলে মানুষের বেঁচে থাকা কিছুটা পশুপালন – কারণ জঙ্গল তাদের চারণভূমি, কিছুটা গাছপালা-ফল মূল আর অল্প কিছুটা কৃষি – এই রকম একটা ছকে বাঁধা। জঙ্গল ক্রমাগত সংরক্ষিত (পড়ুন বাণিজ্যিক কারণে সংরক্ষিত – মাথায় রাখতে হবে এরই মধ্য চিপকো আন্দোলন হচ্ছে ১৯৭০) হতে থাকার ফলে গাছ কাটা ও সেই গাছকে একধরণের স্পিসিস দিয়ে ভরিয়ে তোলা জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্থানীয় মানুষের আর কোনও সদর্থক ভূমিকা থাকে না – কারণ জঙ্গল নিয়ে তারা উৎসাহ হারাচ্ছেন। কৃষি নির্ভরতা প্রচন্ড বেড়ে যায় (এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া – উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশরা যখন কারিগরনির্ভর সমাজ ভেঙ্গে দিচ্ছেন তখন একদফা কৃষি নির্ভরতা

বেড়েছিল। ১৮২১ সালে যেখানে দেশে কৃষক ছিলেন ৪৮%, তা ১৯২১এ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৩%। এবারের নির্ভরতা বাড়ে কিছু জায়গায় - মূলতঃ জঙ্গল কেড়ে নেওয়ার কারণে)। ফলে জমি লাঙ্গল দেওয়া, মাটি ওলোটপালট ইত্যাদি – কৃষি যে এক অর্থে অপ্রাকৃতিক, এটা মেনে নেওয়া ছাড়া তো উপায় নেই! এটার পাশাপাশি হাত ধরে আসছে বাঁধ, রাস্তা, শহর, উন্নয়ন – আসছে উৎকর্ষতার জন্য প্রবল চাহিদা। পাহাড়ি মিলেট নয়, সাদা হাইব্রিড চালই আসল খাদ্য – এই অ্যাস্পিরেশন। একথা বুঝতে পারছেন না স্থানীয় মানুষেরা, তা নয়। যখন বুঝতে পারছেন তখন আর ফিরে যাওয়ার পরিকাঠামো নেই। এখনও আর ফিরে আসার পরিকাঠামো নেই। সঙ্গে আরও হয়রানি। রাণীক্ষেতের কাছে যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরছি – দেখছি কৃষকরা চাষে উৎসাহী নন। তার একটা প্রধান কারণ হনুমানের উৎপাত। মাঠ কে মাঠ খালি পড়ে, কারণ হনুমান সব খেয়ে নেবে। তার দোসর বুনো শুওর। জঙ্গলে খাবার নেই – কারণ সবই তো পাইন বন প্রায়। উপরন্তু হাল আমলে হনুমানের কদর বাড়ায় ট্রাকে করে শহর থেকে অবাঞ্ছিত হনুমান ধরে এনে জঙ্গলে ছেড়ে যাচ্ছেন কারা যেন! বনদপ্তর? আমি ঠিক জানি না। জঙ্গলে খাবার নেই, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, শহুরে হনুমানের জঙ্গল থেকে খাবার খাওয়ার অভ্যাস নেই। যাই হোক, এই সবের ফলে কিন্তু চাষে ফেরা, জঙ্গলে ফেরা প্রায় দুষ্কর। পুরোনো ফসল ফিরে আসছে – পাঁচ রকম দেশী রাগী, তিন রকম গম ফিরে আসছে – দিদিমারা মনে করতে পারছেন পুরোনো রেসিপি, কিন্তু চাষের ধরণ গেছে বদলে। খাবারের উপর বাজারের নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসেছে।

জঙ্গল একটা অঞ্চলের বৈচিত্রকে, জীবনকে ধারণ করে। সেটা শুধু মাত্র প্রয়োজনে নয়। আপাত অপ্রয়োজনেও। একটু আগে বলা ইয়েলোস্টোনের নেকড়ের গল্পটা মনে করুন। অচাষকৃত খাদ্য, পুষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের যোগানদার । এছাড়াও পশুখাদ্য, জ্বালানি, ওষধি গাছ, কাঠ ছাড়া অন্যান্য জিনিস থেকে পাওয়া আয়ের উৎস। জঙ্গলের চরিত্র বদলে গেলে আশপাশ, মানুষের জীবন-জীবিকা সব ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে – তা কিন্তু মাঝে মাঝে ইরিভার্সেবলও হয়ে যেতে পারে। পশ্চিমঘাটের চুড়ার কাছে মোষ পালক গাভলি সম্প্রদায় জঙ্গলের দেখভাল করত কারণ তা থেকে তাদের পশু খাদ্য আসত, আসত নিজেদেরও খাবার। দুধ থেকে তোলা মাখন তারা কুনবি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিনিময় করত। কুনবিদের প্রধান জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল শিকার – তারাও শিকারের প্রয়োজনেই জঙ্গলকে বাঁচাত। একই জায়গায় পারস্পরিক সহাবস্থান, এবং জঙ্গল রক্ষার এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরন। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক চাপে এই জঙ্গল-কুনবি-গাভলিদের ত্রিমুখী সম্পর্ক বদলে গেছে । এ রকম আরও অনেক উদাহরণ আছে যেখানে বনাঞ্চলে পশুপালকদের অধিকার চলে যাওয়ায় একদিকে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমে আসছে, অন্য দিকে তারা জঙ্গলের প্রতি মমত্বও হারিয়ে ফেলছে। ফলে জঙ্গলের বদলে সেখানে হয় চাষজমি, নয় ইউক্যালিপ্টাসের জঙ্গল, নয় খনি গজিয়ে উঠছে। একদিনে নয়। ধীরে ধীরে। পেশা বদলে ফেললে জঙ্গলের সঙ্গে ভালোবাসাও বদলে যেতে পারে, তার সঙ্গে একটা

অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক-বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থাও।

এই ব্যাপারটা আন্দাজ করেই হয়ত জঙ্গল ও তার আশেপাশের অধিবাসীরা উৎসর্গীকৃত জঙ্গল বা ঠাকুরথান বা সেক্রেড গ্রোভস হিসাবে কিছুটা জায়গা লোকজনের জন্য নিষিদ্ধ করে রাখতেন – যেখানে গাছ কাটা বা অন্যান্য ব্যবহার বারণ ছিল। আমাদের ধারণায় 'পিছিয়ে থাকা' বা 'অনুন্নত' জায়গায় এখনও সেই প্রথা আছে। অনেক সময় এই সংরক্ষণকে ধর্মের আচ্ছাদন দিয়ে পোক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকার সিয়েরা লিওনে দেশে এই রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। এমন কড়াকড়ি, যে আমাকে সেখানে ঢুকতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেখানে কেমন সব গাছপালা জীবজন্তু থাকতে পারে তা কল্পনা করেই আমাকে শিহরিত হতে হয়েছে।

পৃথিবী জুড়ে কলোনি স্থাপনের একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল দাস সংগ্রহ করা। যেখানে পারেনি, যেমন ভারতবর্ষ, সেখানে সম্পদ লুঠ। সে কর চাপানোই হোক বা শিল্পকে নির্মূল করে কাঁচামাল নিয়ে যাওয়াই হোক বা সাধারণের জঙ্গল-জমিকে রাষ্ট্রের অধীনে এনে কাঠ কেটে লন্ডনে বাড়ি বানানোই হোক। কারণ আমাকে উৎকৃষ্ট হতে গেলে অন্যকে নিকৃষ্ট করে তোলা ছাড়া তো উপায় নেই। তাছাড়াও জ্বালানী হিসাবে বা রেললাইনের জন্য জঙ্গল কম কাটা হয়নি।

মানুষকে জঙ্গল থেকে সরিয়ে দেওয়ার একটা বড় কারণ দেখানো হয়েছিল বন্য প্রানী সংরক্ষণ। জঙ্গলের মানুষ নাকি সব মেরে খেয়ে ফেলবে! অথচ এতদিন ধরে মানুষ শিকার করে খেয়ে আসছে, জঙ্গল শেষ হয়নি – ১৭৫৭র পরেই কেন তা হতে থাকল? এই সমস্ত কিছুর পিছনে মজা করার জন্য প্রাণী হত্যার একটা মস্ত ভূমিকা আছে তা ভুলে গেলে চলবে না। ব্রিটিশরা আসার আগে মৃগয়ার জন্য নির্দিষ্ট জঙ্গল ছিল, আর যেহেতু বন্দুক আসছে না তাই সে ভাবে কিন্তু বন্য জন্তু শেষ হচ্ছে না – তীর ধনুক বর্শায় আর কত প্রাণী হত্যা সম্ভব! মৃগয়া অঞ্চলের বাইরে একটা বৃহৎ জায়গায় মানুষ নিজের খাদ্যের প্রয়োজনে পরিমিতির সঙ্গে শিকার করেছে এবং সংরক্ষণও করেছে। ব্রিটিশরা যখন আসছে, তারা শুধু গাছ নয়, এই প্রাণীদেরও পায়। ড্রয়িং রুমে সিংহের মাথা রাখা তাদের এমন নেশা হয়ে যায় যে ১৯০০ সালের কাছাকাছি গিরের কিছু সিংহ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সব সিংহের মাথা দেওয়ালে শোভা পেতে থাকে – এ কিন্তু জৈবিক প্রয়োজন ছিল না। গোয়ালিয়রে রাজপ্রাসাদে গেলে এখনও হাতির পায়ের বসার জায়গা, হরিণের খুরের টেবিলের পায়া এই নির্লজ্জ দেখানেপনার জলজ্যান্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন উদাহরণ আমরা অন্য দেশেও দেখছি। আফ্রিকা আর কানাডা থেকে ২০০৫ ও ২০১৪ সালে মধ্যে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬০ হাজার বড় প্রানীর মাথা ট্রফি হিসাবে আমেরিকায় পাচার হয়েছে – তা কিন্তু স্থানীয় মানুষ করেননি। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের আদিবাসীরা বাইসন শিকার করতেন মাংস ও চামড়ার জন্য – কিন্তু বাইসনের সঙ্গে তাদের ছিল আত্মার যোগ। ঔপনিবেশিক সাদা চামড়ার মানুষেরা বাইসন মারা শুরু করার পর ১৮০০ সালে ৬

কোটি বাইসন থেকে ১৮৩০ সালে ৪ কোটি এবং ১৯০০ সালে তা ৫০০ তে নেমে আসে। হালে, ১৯৩৮ সালের ১২ই নভেম্বর একদিনে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো অধুনা কেওলাদেও ন্যাশানাল পার্কে ৪২৭৩টি পাখি মারছেন। এগুলোর কেউই কিন্তু স্থানীয় মানুষ করেননি। অথচ ১৯৮২ সালে জাতীয় উদ্যান হওয়ার পর কেওলাদেও ন্যাশানাল পার্কে স্থানীয় মানুষদের মোষ চড়ানোর অধিকার যায়। এই পার্কের জীববৈচিত্রের উপরে মোষ চড়ানোর একটা ধনাত্মক প্রভাব ছিল। মোষ চড়ানো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে জলাভূমি ঘাসে বুজে যায়। মোষের খাওয়ার সময় টান পড়ে যে সব ঘাস আলগা হয়ে যায়, তার মূল যে সারসদের খাবার, তারা আসা বন্ধ করে দেয়। মোষ না চড়াতে পারার অসন্তোষে বিক্ষোভ দেখানোর সময় ৭ জন মানুষকে পুলিশ গুলি করে মারে।

আদিবাসীরা শিকার করছেন রাজাদের নির্ধারিত মৃগয়াঞ্চলের বাইরে – কিন্তু সেখানে কৃষকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকছে নিবিড়। কারণ তারা সাধারণতঃ শিকার করছে তৃণভোজী, ফসল খাওয়া প্রাণীদের। এই আদিবাসীদের কেউ কেউ আবার ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশদের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন। সুতরাং মৃগয়াঞ্চলের বাইরের জঙ্গলের একচ্ছত্র অধিকার এবং আদিবাসীদের সায়েস্তা করার জন্য এক ঢিলে দুই পাখি – ১৮৭১ সালের অপরাধ মূলক উপজাতি আইন - যেখানে এই সব আদিবাসীদের একটা নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে নিজেদের গতিবিধিকে আবদ্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়। স্বাধীনতার পরে এই আইন বাতিল হয়, কিন্তু ১৯৫২র অভ্যাসগত অপরাধী আইন থেকেই যায়। ১৯৭২ এর বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে এদের বংশপরম্পরার জীবনচর্যাকে সম্পূর্ণভাবে বেআইনী করে দেওয়া হয়। ১৯৭২ এর আগে বনবিভাগের ক্ষমতা প্রায় ২৩% বনভূমির মধ্যে ছিল, এই আইনের ফলে তা প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। গাছ কাটা কি তাতে কমে গেল?

জঙ্গল থেকে মানুষকে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার পিছনে আমাদের একটা 'অভিজাত' ধারণা আছে। আমরা বারবার মনে করে এসেছি জঙ্গল নির্ভর অধিবাসীরাই জঙ্গল শেষ করার জন্য দায়ী। আমি পাহাড়িয়াদের কাছ থেকে কিছুদিন শেখার চেষ্টা করছিলাম যে তারা জঙ্গল থেকে কী কী সংগ্রহ করে খায় – প্রায় ১২৭ ধরণের অচাষকৃত জিনিস পেয়েছিলাম – যা প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মুখে। তার একটা মস্ত কারণ, ঘেঁটে দেখা গেল, রেশনের চাল আসার পরে তাদের রেশন নির্ভরতা। তখন জংলী খাবারের প্রয়োজন কমে কমে আসে – ফলে জঙ্গলের প্রয়োজনও, এবং জঙ্গলকে ভালোবাসার প্রয়োজনও। জঙ্গল যখন মানুষের জীবন জীবিকার জন্য প্রয়োজন হয় বা তাদের সরাসরি অধিকারের আওতায় থাকে (বা বলা ভালো – ছিল) ততদিন পর্যন্ত তার অবস্থা ভালোই থাকে। বনবিভাগ নয়, ১৯৯৮ সালে সলমন খানকে হরিণ মারতে দেখে হাতেনাতে ধরে স্থানীয় মানুষরাই – এবং এখনও তারাই কেস চালাচ্ছেন। গোয়াতে মল্লেম জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে রেললাইন যাওয়ার প্রতিরোধও করেছেন স্থানীয় মানুষ। সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মগিরিতে লড়াই করেছিলেন আদিবাসীরাই। শিবরাজ চৌহানকে স্থানীয় মানুষই বাধ্য করে মহারাস্ট্রের বনভূমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে না দিতে। রাজস্থানের খেজারলি

গ্রামের বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের ৩৫০ জন মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছিলেন গাছ বাঁচাতে – সে অঞ্চলের রাজা গাছ কেটে মাটি থেকে চুনাপাথর তুলে প্রসাদ বানাতে চেয়েছিলেন। সেই গ্রাম এখন রাজস্থানে মরুদ্যান। গাদচিরোলির মেন্দা গ্রামের গল্প আমরা জানি। ১৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে হতে থাকা দেউচা পাচামির কয়লাখনির কথা জানি, যেখানে প্রায় ১২০০০ একর আদিবাসী জমি খনির আওতায় যাবে। এখানেও প্রতিবাদে নেমেছেন স্থানীয় মানুষই । খনি, মাছের ভেড়ি, কৃষিপণ্য - এই সব নানা কারণে জঙ্গলকে বলি হতে হয়েছে। জঙ্গলের সাথে সাথে মানুষকেও – প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের উগ্রপন্থী বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

১৯৭২এর বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে স্থানীয় মানুষকে প্রায় পাকাপাকি ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাতে রাতারাতি জঙ্গল ভালো হয়ে যায়, বেড়ে যায় – এমন কিন্তু নয়। ১৯৭২ সালে নাসা এবং আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের ল্যান্ডস্যাট প্রোগ্রাম চালু হওয়ায় স্যাটেলাইট ম্যাপ দিয়ে বনাঞ্চল মাপার সুবিধা পাওয়া শুরু হয়। ১৯৮০তে ল্যান্ডস্যাটের দেওয়া তথ্যে দেশে বন আচ্ছাদন পাওয়া যায় ১৫% - যেখানে বন দপ্তরের দাবী ২৩%। দর কষাকষি করে ঠিক হয় ১৯%! এরকম মুখ পোড়ানো ঘটনা সব সময় সামনে আসেনা যদিও। মাধব গ্যাডগিলের লেখায় পাচ্ছি - সরিস্কা জঙ্গলে ২০০৪ সালেও যখন বনদপ্তর দাবী করছেন ১৭টি বাঘ আছে, তখন কর্মীদের দাবী বাঘের সংখ্যা শূন্য। সিবিআই এই কেলেংকারি তদন্ত করে জানায় বনকর্মীরাই ঠিক – যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং বনদপ্তরের হাতে চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, সেটা কষ্ট কল্পনা মাত্র।

মানুষ পরিবেশের অংশ - বিশেষতঃ সেইসব মানুষ যারা প্রকৃতির মধ্যেই আছেন। মানুষ স্বভাবগতভাবে মাংসাশী – তা আমাদের উৎসেচক, পেটের মধ্যে ব্যাক্টেরিয়া ইত্যাদির পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। মানুষ বাস্তুতন্ত্রে খাদক। সংরক্ষণের নামে তাকে সেখান থেকে স্থানচ্যুত করলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যই বিগড়ে যাবে।

তার উদাহরণের কথা বলতে গেলে শহুরে অভিজাত সংরক্ষণবাদের আর একটা বিতর্কিত দিক সামনে চলে আসবে। নীলগাই, বুনো শুওর, হনুমান – এরা বিপন্ন প্রাণী নয়। কোনও বন্যপ্রাণ মারা যাবে না - এই নিয়মে এদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে এদের আক্রমণে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। অথচ এদের মারার অধিকারও নেই। এই তিনটি প্রাণীকেই দিব্যি খাওয়া যায়। মানুষকে বাদ দিয়ে (পড়ুন আদিবাসী, জঙ্গল নির্ভর, জঙ্গল সন্নিহিত মানুষকে বাদ দিয়ে) প্রকৃতিকে দেখার, হাতি ও বাঘকে দেখার, এই দোষে অনেক প্রখ্যাত পরিবেশবিদও দায়ী। আমার চেনা পরিচিত বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ একে মেগাফোনা সিন্ড্রোম বলেন। স্টকহোম কনফারেন্সের একটা ফল এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন – সেটার ফলে শিকার বন্ধ হয়ে যায় বটে, কিন্তু জঙ্গলকে, মূলতঃ বাঘকে কেন্দ্র করে পর্যটন হয়ে ওঠে রোজগারের নতুন রাস্তা। সে রাস্তা দেখিয়েছেন ব্রিটিশরাই – আর তার মদমত্ত রূপ আমরা এখন সুন্দরবনে দেখছি। ইকোটুরিজমের বিভীষিকা।

মেগাফোনাদের বাইরেও জৈববৈচিত্র রয়েছে। রয়েছে নদীতে, পুকুরে, জলাভূমিতে, এমনকি শহরেও – তারাও কম বিপদে নেই। সে ঘড়িয়াল হোক, গঙ্গার শুশুক হোক বা বাঘরোল হোক। মানুষের জীবিকায় লাগাম দেওয়া না হয় হল, কিন্তু দূষণ, শহরায়ন, নদী নষ্ট করা, পুকুর বুজিয়ে দেওয়া – বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পরিপন্থী এই সব দিকগুলি আমরা কবে দেখেছি? নাকি সেগুলি বিশেষ কিছু মানুষের অর্থনৈতিক আয়ের উৎস বলে তাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকতে হচ্ছে!

একদিকে আদিবাসীরা যারা সেই অর্থে সরকারী স্বীকৃতি ছাড়াই দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ধরে বাস করে আসছে জঙ্গল সন্নিহিত জায়গায়, সেখানে তাদের সরকার থেকে পাট্টা দেওয়া চলছে – অন্য দিকে বনদপ্তর তাদের অধিকারবলে এই সব পাট্টা পাওয়া মানুষদের বহিরাগত বলে বেদখল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে – ১৯৮০র আগের সময়টা (Sharma 1991) এমনি করেই চলে যেতে থাকে। সরকারিভাবে 'জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট' বা যৌথ বন ব্যবস্থাপনার আওতায় জঙ্গলের নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় মানুষের হাতে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ১৯৯০ নাগাদ – মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গে এর সাফল্য দেখে। ১৫~১৬ বছেরে মধ্য প্রায় ৮০লক্ষ মানুষ, ৮৪০০০ কমিটি, ১৭ মিলিয়ন হেক্টর জঙ্গল এই ব্যবস্থাপনার অধীনে আসে। কিন্তু ভারতবর্ষের বছর বছর চলে আসা যে আদি জঙ্গল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা – তাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। যৌথ বন ব্যবস্থাপনার মূল সুরটাই যেন ব্যবহারের – জঙ্গলকে কিভাবে মানুষ ব্যবহার করবে, ভাগাভাগি করবে তার উৎপাদন। জঙ্গলকে একটা প্রয়োজনীয় বাস্তুতন্ত্র হিসাবে দেখার চশমাটা এখানে প্রায় বিলুপ্ত। যাইহোক, পাশাপাশি কিন্তু কর্পোরেটেকে দিতে থাকা অধিকার লাগু থাকছে। কর্ণাটকের পেপার মিল যখন এক টন বাঁশ কিনছে ১৫ টাকায়, তখন স্থানীয় মানুষকে কিনতে হয় ১২০০ টাকায় । বাঁশগাছের জঙ্গল হাপিশ হয়ে যেতে থাকে – এদিকে স্থানীয় মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজেদের আশপাশের জঙ্গল প্রয়োজনের তাগিদে হাপিশ করে দিতে থাকে। কমিউনিটি ফরেস্ট – অর্থাৎ স্থানীয় মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সংরক্ষিত জঙ্গলের ধারণা কাগজকলমের বাইরে আর গড়ে ওঠে না – জঙ্গল ধীরে ধীরে জৈবিক প্রয়োজনের বাইরে পণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠতে থাকে।

২০০৫ এর হিসাব অনুযায়ী, ৯২টি ন্যাশন্যাল পার্ক, ৫০০ স্যাঞ্চুয়ারি মিলে প্রায় ১৬ মিলিয়ন হেক্টরের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে (MoEF 2005)। এই সংরক্ষণের আওতায় কিছু কিছু প্রানী, গাছপালা জঙ্গলকে বাঁচানো যাচ্ছে এ কথা ঠিক। কিন্তু এই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যেও প্রায় ৬৯শতাংশ ক্ষেত্রে মানুষ রয়েছেন ভিতরে – প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ। এই সব সংরক্ষণ অথবা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন – কোনোটাই তাদের সঙ্গে আলোচনা করে করা হচ্ছে না। ফলে তাদের অধিকার, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের অধিকার খর্ব হচ্ছে। অন্য দিকে জঙ্গল থেকে বার করে তাদের পুনর্স্থাপিত করাও যাচ্ছে না ঠিক ঠাক।

ভারতের সাধারণ মানুষের ইতিহাসের পুরোটাই প্রায় উচ্ছেদের ইতিহাস – কোনও সরকারি তথ্য নেই – তবে তার সংখ্য দু-আড়াইকোটি উদ্বাস্তুর নীচে হবে না। মানুষকে যখন উচ্ছেদ করে দেওয়া হয় তার শতাব্দী প্রাচীন বাসস্থান থেকে, তখন তো শুধু তার ভূগোল কেড়ে নেওয়া হয় এমন নয় – তার ইতিহাস, তার জীবিকা, বেঁচে থাকার দক্ষতা, সব থেকেই তাকে উৎখাত করে দেওয়া হয়। ফলে তার পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করাই মুশকিল হয়ে ওঠে। জঙ্গলের সঙ্গে জড়িত সব আদি কাজকর্মকে বেআইনি করে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য ঘুষ দিতে হচ্ছে বন দপ্তরের কর্মীদের। ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্ট এমনও বলে যে মরা গাছ, পড়ে থাকা ডালপালা, ঘাস কিছুই সংগ্রহ করা যাবে না জঙ্গল থেকে । রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছিত্তিশগড় – এই সব জায়গায় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রায় ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

ব্রিটিশ আমলে জঙ্গলের অধিকার নিয়ে যেভাবে মানুষকে হেনস্থা করা হয়েছিল, অথবা তার পরেও - তা ২০০৬ এর অরণ্য অধিকার আইনে অনেক শুধরে আসে। যদিও তার আগে বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির পরিকল্পনা আছে যেখানে পঞ্চায়েত স্তরের কমিটির হাতে স্থানীয় জৈববৈচিত্র সংরক্ষণের অধিকার থাকবে। তাদের হাতে থাকবের গণজৈববৈচিত্র নথি। কাগজে কলমে স্থানীয় মানুষদের কাঠ ছাড়া জঙ্গলের অন্যান্য জিনিস আহরণের অধিকার আসে, জৈববৈচিত্র সংক্রান্ত কোনও জ্ঞানের গোষ্ঠীগত অধিকার আসে। হালে আবার জঙ্গল সংরক্ষণ আইনের বদলের প্রস্তাব আসছে – কারণ অধিকার মানুষের হাতে তুলে দিতে গণতান্ত্রিক রাস্ট্রও মন থেকে পেরে ওঠে না। জঙ্গলের সংজ্ঞা হিসাবে ১৯২৭ সালের 'ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট' বা অন্য আইনে যা লেখা আছে তাইই ধরার কথা বলা হচ্ছে – কোনও 'ডিমড ফরেস্ট' ধরা হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে পাহাড়ের গায়ে অনেক গাছে ঢাকা অঞ্চল জঙ্গলের বাইরে চলে যাচ্ছে - নিয়মগিরি ৯৫% বা আরাবল্লির ৪০% তাহলে জঙ্গলের বাইরে ! এছাড়াও জাতীয় সীমার ১০০ কিমির মধ্যে 'জাতির প্রয়োজনে' রাস্তা ইত্যাদি তৈরির জন্যে জঙ্গল পরিষ্কার করাটাকেও বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। ২০২৩ মার্চে পেশ হওয়ার পরে এই বিল এক বিজেপি নেতার সভাপতিত্বে থাকা জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে যায় – যারা প্রায় ১২০০ প্রতিবাদপত্র উপেক্ষা করে বিনা মন্তব্যে একে ছাড়পত্র দেয়।

বড় বাঁধের কথা এই আলোচনায় এল না - সে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। বড় ড্যামের প্রায় অনেকটাই ওই জঙ্গলের জমিতেই হয় – ফলে বিপুল জায়গা জলে ডুবে গাছ মারা যায়। মানুষের দুর্দশার কথা তো ছেড়েই দিলাম। খনির কথা এল না। অনেকবছর আগে যখন আমি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করি সে সময় মল্লারপুরে পাথরখাদানে আদিবাসীদের নিয়ে কিছু কাজে জড়িয়ে পড়ি। তখন দেখেছি শ্রমিকদের সিলিকোসিস, জঙ্গলের গায়ে ঘায়ের মত হয়ে থাকা উন্মুক্ত খনি, দারিদ্র। শুনছি মেয়েদের সন্ধ্যা রাতে ট্রাকে করে তুলে নিয়ে যাওয়া। এসব কিছুর মধ্যে মানুষ এত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, যে ওই অঞ্চলের পশুপাখি গাছপালার কথা সেভাবে ভাবিনি – ভাবার

মত বুদ্ধিও পাকেনি। এখন ডিনামাইট চার্জের ফলে সিকিম অবধি সম্প্রসারিত হতে থাকা রেললাইন সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ভালুকদের বেরিয়ে আসার খবর শুনছি – মল্লারপুরেও নিশ্চয় একই ঘটনা ঘটছিল। কয়লাখনি, পাথরখাদান, নদীতে জমতে থাকা রাসায়নিক সার, কীটনাশক, কারখানার বর্জ্যের ভারী ধাতু – এতে কি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের খুব সুবিধা হচ্ছে? পরিবেশদপ্তরের ছাড় পেয়ে যাচ্ছে কী করে এই সব? অশোকনগরে ঘন জনবসতির মধ্যে হবে তেলের খনি। পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র তাদের ওয়েবসাইটে কিছুদিন আগে পর্যন্তও খুঁজে পাইনি।

জৈবিক প্রয়োজনের খেইএ ফিরে আসি। এই প্রয়োজনটুকুতেই যে গল্প শেষ হল না তা এতক্ষণ খাপছাড়া ভাবে বলার চেষ্টা করলাম। আর স্থানীয় মানুষ অনেক সময় এই প্রয়োজনের ফাঁদে পরে ধ্বংস যজ্ঞে শামিল হচ্ছেন এ কথা যেমন সত্য – কিন্তু তা অর্ধসত্য তা আশা করি বোঝা যাচ্ছে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'-র মত। তার বাইরে যেটা অনুধাবন করতে অস্বস্তি হয় তা হল আমাদের রোলার কোস্টারে চেপে বসা চরিত্র। রোলার কোস্টার হচ্ছে একটা সঙ্ঘাতিক ঢালু জায়গা দিয়ে গড়িয়ে চলার খেলা – কোথাও কিছু আঁকড়ে ধরার নেই, আপনি জানেন আপনি নীচের দিকে দূর্বার গতিতে ছুটে চলেছেন। একরকম অসহায় পরিস্থিতি, আপনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন – অথচ আপনার কিছু করার নেই। এই অসহায়তাটাকেই আপনি উপভোগ করছেন – পতনের অসহায়তা, পতনের উত্তেজনা। এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রজাতি হিসেবে মানুষ একটা রোলার কোস্টারে চেপে বসেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জৈব বৈচিত্রের চূড়ান্ত ব্যবহারে অজৈব উপাদানের ভারসাম্য ইরিভার্সাল ভাবে ঘেঁটে গেছে – একমুখী। ফিরে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। প্রজাতি হিসেবে আমরা পতনের উত্তেজনা উপভোগ করছি কনজিউমারিজমের রাস্তা ধরে। আরও ভোগ, আরও সুবিধা, আরও স্বাচ্ছল্য, আরও অর্থনৈতিক ক্ষমতা, আরও ভূখন্ড দখলের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভুত্ব এই সব কিছুর অর্থ আরও খনিজ জ্বালানি ব্যবহার। এই সরল সম্পর্কটি বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। কিন্তু বুঝেও এই রাস্তায় হাঁটতে থাকা, হাঁটতে থাকাটাই ওই রোলার কোস্টার রাইডের মত। তা নাহলে, যেখানে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যখন দুটো বড় বড় যুদ্ধ চলছে তখন সদ্য দুবাইতে হয়ে যাওয়া জলবায়ু বদলের সম্মেলনে যুদ্ধের কার্বন ফুটপ্রিন্ট, যুদ্ধের জন্য ঘটতে থাকা জলবায়ু বদল নিয়ে কয়েক সেকেন্ড অতিবাহিত করার সময় করে নেওয়া যেত। রোলার কোস্টার থেকে নামার যে অনিচ্ছা তার প্রধান কারণ লুকিয়ে আছে আমাদের উৎকর্ষ সাধনের প্রবল ইচ্ছায়। আমি অন্যের থেকে বেশি বৈভব নিয়ে থাকব। আমরা অন্যের থেকে রোয়াব নিয়ে থাকব। অন্য কোনও প্রজাতির বৈভবের তোয়াক্কা নেই – জৈবিক প্রয়োজন মিটে গেলেই তারা খুশি। এইখানেই মানুষ আসতে আসতে গব্বর সিং হয়ে উঠছে।

তথ্যপঞ্জী

-নেকড়ে কিভাবে নদীকে ফিরিয়ে আনল - https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

-ভারতের জনসংখ্যাতত্ব –

- Economic Survey 2022-23

- Forest Survey of India 2019 - https://fsi.nic.in/isfr19/vol1/chapter10.pdf

- গাছ কাটার পরিসংখ্যান - https://www.deccanherald.com/india/over-30-lakh-trees-cut-in-india-for-developmental-projects-in-2020-21-none-in-delhi-govt-1093284.html

- ইউক্যালিপ্টাস কেন ক্ষতিকর - https://forestrypedia.com/environmental-impacts-of-eucalyptus/

- উত্তরাখন্ডের পাইনবন –

-https://www.downtoearth.org.in/coverage/pine-pressure-14082

-https://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=890#:~:text=At%20least%2019%20Pinus%20species,common%20(Richardson%2C%201998)

- অচাষকৃত খাদ্য - https://ceibatrust.org/wp-content/uploads/2022/08/CEiBa_nl_v3i4_Anshuman.pdf

- চড়াই পথের চারণিক/মাধব গ্যাডগিল

- লুঠ হয়ে যায় স্বদেশ ভূমি/ দেবল দেব

- Gadgil M, Let our rightful forests flourish

- Decentralisation for cost effective conservation/Somanathan et.al

- মেন্ধালেখা গ্রামের কথা - https://kalpavriksh.org/mendha-lekha-village/

- দেওচা-পাচামী - https://thewire.in/rights/deucha-pachami-coal-tribal-residents-land-tmc-govt#:~:text=The%20proposed%20Deucha%20

Pachami%20coal,%25)%20belonging%20to%20tribal%20residents

- Environment and Human Rights/ Ashish Kothari & Anuprita Patel

- জঙ্গল থেকে কী সংগ্রহ করা যাবেঃ সুপ্রিম কোর্টের বির্দেশ - I.A. No.548 of 2000 in writ petition (civil) No.202 of 1995

-জঙ্গল সংরক্ষণ আইনের পরিবর্তন - https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/explained-what-will-the-amended-forest-conservation-act-change/article67146543.ece

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইসুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলা, দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী সমীক্ষা, বহু রামায়ণ বিষয়ক সমীক্ষা উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা, বাংলার হাট এবং চলতি পুথি কথামৃত বিষয়ে আলাপ - কিভাবে আজকের যুবা কথামৃত বুঝছে।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব
৩০। দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে - উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় সম্মেলন সমীক্ষা
৩১। বাঙলার হাট: একটি সাম্যবাদী পরম্পরা
৩২। 'কথামৃত' আনকাট এবং... 'কি করিতে হইবে (না) - আদিদেবের সঙ্গে আলাপচারিতা
৩৩। বনজঙ্গল গাছপালা

জ্ঞানগঞ্জ তত্ত্ব
জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা
জ্ঞানগঞ্জ